সাধন চট্টোপাধ্যায়ের ‘জলতিমির’ উপন্যাসে বিশ্বায়ন ও নিম্নবর্গের সংকট

Amaresh Biswas

Research Scholar, Visva-Bharati

সারসংক্ষেপ : নিম্নবর্গ হল সেইসব দরিদ্র শ্রমজীবী সাধারণ মানুষেরা, যারা সবচেয়ে কম খেয়ে-পরে বাকি সকলের পরিচর্যা করে। সবচেয়ে বেশি পরিশ্রম করে আবার তাদেরই সবচেয়ে বেশি অসম্মান-অশ্রদ্ধা হয়—উপরওয়ালারা খুব সহজেই তাদের উপর তর্জন-গর্জন করে। তারা জীবনযাত্রায় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য প্রদানকারী সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত, দেশের সম্পদের উচ্ছিষ্টে প্রতিপালিত। সাধন চট্টোপাধ্যায়ের ‘জলতিমির’ উপন্যাসে এই নিম্নবর্গের সংকটের ছবি মূর্ত হয়ে উঠেছে। এই সংকট বিশ্বায়নের সঙ্গে সম্পর্কিত, বিশ্বায়নের কারণে নিম্নবর্গের মানুষেরা ক্ষতিগ্রস্ত।

সূচক শব্দ : নিম্নবর্গ, বিশ্বায়ন, আর্সেনিক

রণজিৎ গুহ ‘সাবলটার্ন’ (Subaltern) শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ করেছেন ‘নিম্নবর্গ’। সাবলটার্ন শব্দটি ইংরেজি ভাষাতে বিশেষরূপে সামরিক সংগঠনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়—ক্যাপ্টেনের অধস্তন বা নিম্নস্থিত অফিসারদেরকে বলা হয় সাবলটার্ন। পাশাপাশি অ্যারিস্টটলের ন্যায়শাস্ত্রে সাবলটার্ন হল এমন একটি বচন যা সর্বদা অন্য বচনের অধীন যা বিশিষ্ট মূর্ত এবং সার্বিক নয়। এই ক্ষেত্রে ‘অধীন’ শব্দটি সবদিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ। এই অধীন হল শ্রেণিবিভক্ত অসম বিকাশের সমাজবাস্তবতায় কর্তৃত্বের অধীন, ক্ষমতার অধীন, আধিপত্যবাদের অধীন। উক্ত ক্রমঅধীনতা সমাজে এক শ্রেণির মানুষকে উচ্চতায় তুলে নিয়ে যায়। আর এক শ্রেণিকে নীচে নামিয়ে আনে। সমাজের এই নীচে থাকা মানুষেরাই প্রধানত নিম্নবর্গ।[১]

দার্শনিক আন্তোনিও গ্রামশি (১৮৯১-১৯৩৭) সাবলটার্ন শব্দটি ব্যবহার করেন অন্তত দুটি অর্থে—একটি অর্থে এটি ‘প্রলেটারিয়েট’ এর প্রতিশব্দ। অন্য অর্থে তিনি বলেছেন, যেকোনো শ্রেণিবিভক্ত সমাজে ক্ষমতাবিন্যাসে, সামাজিক সম্পর্কের প্রক্রিয়ার মধ্যে—যার এক মেরুতে অবস্থান করে প্রভুত্বের অধিকারী ‘ডমিন্যান্ট শ্রেণি’, আর অপর মেরুতে যারা অধীন সেই ‘সাবলটার্ন’ শ্রেণি। উচ্চবর্গ/নিম্নবর্গ এর সংজ্ঞা নির্ণয় করা হয়েছে সামাজিক সম্পর্কের সেই সমতলে যেখানে ক্ষমতাই মূল কথা। যেখানে প্রভুত্ব/অধীনতার এক বিশিষ্ট কাঠামোর মধ্যে সামাজিক সম্পর্কটি বাঁধা থাকে।[২]

রণজিৎ গুহ ঔপনিবেশিক পর্বের আলোচনাতে উচ্চবর্গ বলতে তাদেরকে বোঝাতে চেয়েছেন, যারা ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষে ছিল প্রভুশক্তির অধিকারী। এই প্রভুস্থানীয়দের আবার তিনি দুই ভাগে ভাগ করেন—বিদেশি ও দেশি। বিদেশি প্রভুদের মধ্যে এই সংজ্ঞা অনুযায়ী তারাও দুই ধরনের—সরকারি এবং বেসরকারি। সরকারি বলে গণ্য হবে ঔপনিবেশিক ভারতের অভারতীয় কর্মচারী এবং ভৃত্য সবাই, এবং বেসরকারি হল বিদেশিদের মধ্যে যারা বণিক, শিল্পপতি, খনির মালিক, অর্থব্যবসায়ী, জমিদার, নীলকুঠি চা-বাগান কফিক্ষেত কিংবা ওই জাতীয় যেসব সম্পদ প্লান্টেশন পদ্ধতিতে চাষ করা হয় তার মালিক এবং কর্মচারী, যাজক, খ্রিস্টান মিশনারি, পরিব্রাজক ইত্যাদি। দেশি প্রভুদের মধ্যে একটা বড়ো অংশ ছিল সর্বভারতীয় এবং আঞ্চলিক স্বার্থের পার্থক্য অনুযায়ী। সর্বভারতীয় বলতে গণ্য বৃহত্তম সামন্তপ্রভুরা বাণিজ্যে এবং শিল্পে লিপ্ত সবচেয়ে শক্তিশালী বুর্জোয়ারা এবং ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্রে কিংবা শাসনযন্ত্রের অন্যত্র যারা সবচেয়ে উচ্চপদের অধিকারী ছিল।[৩]

দেশি প্রভুগোষ্ঠীদের স্থানীয় বা আঞ্চলিক প্রতিনিধিরাও দুইরকমের। একরকম হল তারাই যারা সর্বভারতীয় প্রভুগোষ্ঠীর অন্তর্গত হলেও বিশেষ অবস্থায় ক্ষমতাবিন্যাসে স্থানীয় বা আঞ্চলিক উপাদান হিসেবে সক্রিয়। আর একরকম হল তারা যাদের প্রভুত্ব ষোলআনাই স্থানীয় বা আঞ্চলিক, বা যারা অন্য সব অর্থে প্রভুগোষ্ঠীর মধ্যে গণ্য না হলেও স্থানীয় বা আঞ্চলিক অবস্থায় প্রভুগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি এবং স্বার্থ অনুযায়ী কাজ করে, নিজেদের প্রকৃত সামাজিক সত্তার ধর্ম অনুযায়ী কার্য করে না।[৪]

যারা এই সংজ্ঞা অনুসারে ঔপনিবেশিক ভারতে উচ্চবর্গের অন্তর্ভুক্ত, সমগ্র জনসংখ্যা থেকে তাদেরকে বাদ দিয়ে দিলে যারা অবশিষ্ট থাকে তারাই নিম্নবর্গ। শহরের শ্রমিক ও গরিব, সর্বোচ্চ পদের আমলাদেরকে বাদ দিলে মধ্যবিত্তের বাকি অংশ, গ্রামে ক্ষেতমজুর, গরিব চাষী, প্রায় গরিব-মাঝারি এরা সবাই

নিম্নবর্গের অন্তর্গত।[৫] নিম্নবর্গ হল সেইসব দরিদ্র শ্রমজীবী সাধারণ মানুষেরা, যারা সবচেয়ে কম খেয়ে-পরে বাকি সকলের পরিচর্যা করে। সবচেয়ে বেশি পরিশ্রম করে আবার তাদেরই সবচেয়ে বেশি অসম্মান-অশ্রদ্ধা হয়—উপরওয়ালারা খুব সহজেই তাদের উপর তর্জন-গর্জন করে। তারা জীবনযাত্রায় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য প্রদানকারী সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত, দেশের সম্পদের উচ্ছিষ্টে প্রতিপালিত।

সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'জলতিমির' উপন্যাসে এই নিম্নবর্গের সংকটের ছবি মূর্ত হয়ে উঠেছে। এই সংকট বিশ্বায়নের সঙ্গে সম্পর্কিত, বিশ্বায়নের কারণে নিম্নবর্গের মানুষেরা ক্ষতিগ্রস্ত। উপন্যাসটি লেখকের সমাজ সচেতনতার ফসল, পরিবেশ দূষণকে বিষয়ভাবনার কেন্দ্রে রেখে বিপন্ন মানুষের দুর্দশার মরমী চিত্র অঙ্কন করেছেন। বাংলার অখ্যাত গ্রামে ক্ষেতমজুর-শ্রমজীবীর পেট খারাপ হয়ে অসুস্থ হওয়া বা মরার পিছনে খুঁজলে কারণরূপে বিশ্বায়নকে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে, লেখক সেদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। উপন্যাসে দেখি দূষিত-বিষাক্ত জল খেয়ে বহু মানুষ আক্রান্ত এবং ইতিমধ্যে বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে। পানীয় জলে এই বিষ হল আর্সেনিক। উচ্চফলনশীল বীজ প্রয়োগে চাষের দস্তুর শুরু হবার পর থেকেই কৃষিতে হুহু করে জলের চাহিদা বেড়ে গিয়েছে, কারণ উচ্চফলনশীল বীজে যে পদ্ধতিতে চাষ হয় প্রচুর জলের প্রয়োজন হয়। সেই জলের যোগান দিতে জল তোলা হয় ভূগর্ভ থেকে আর এভাবেই জলে আর্সেনিকের সংমিশ্রণ ঘটেছে। আর্সেনিক হল সাদা আধা-ধাতব গুঁড়ো গুঁড়ো একরকমের পদার্থ। এর কিছু কিছু যৌগ খুবই ক্ষতিকর দেহে ঢুকলে মৃত্যু ঘটে। ইতিহাসে এরকম শ্রুতি রয়েছে যে ফরাসি বীর নেপোলিয়ানকে একটু একটু করে আর্সেনিক বিষ দিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। জলের মধ্যে আর্সেনিকের চার রকমের রূপভেদ লক্ষ্য করা যায় অর্থাৎ চার প্রকারের আর্সেনিকের যৌগ—১) আর্সেনাইট ২) আর্সেনেট ৩) মিথাইল আর্সেনিক অ্যাসিড ৪) ডাই মিথাইল আর্সেনিকো অ্যাসিড। এগুলির মধ্যে প্রথম দুটি জলে ৫০ শতাংশ করে পাওয়া যায়। অবশিষ্ট দুটি রূপ জলে সাধারণত থাকে না। প্রথম দুটির মধ্যে আর্সেনাইট রূপটি আর্সেনেটের চেয়ে ৬০ গুণ বেশি ক্ষতিকর। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা পানীয় জলের ক্ষেত্রে আর্সেনিকের পরিমাণ অনুমোদন করেছে .০১ মিলিগ্রাম/লিটার অর্থাৎ এক লিটার জলে এক মিলিগ্রামের ১০০ ভাগের একভাগ আর্সেনিক থাকলে তবে তা পান করতে কোনো সমস্যা নেই। খুব বেশি হলে সেটা .০৫ অর্থাৎ মিলিগ্রামের একশ ভাগের পাঁচ ভাগ। তার বেশি হলে মৃত্যু হতে পারে।

গবেষণাতে পাওয়া গিয়েছে যে ৪৫০ কিলোমিটার একটি ভূ-স্তর রয়েছে যা আর্সেনিক দ্বারা পুষ্ট, কাদাপলি দ্বারা গঠিত। এটি অবস্থান করছে ভূ-তল থেকে প্রায় ৭০ ফুট এবং ২০০ ফুট গভীরতার মধ্যে। এই ভূ-স্তরটি এদেশে ভাগীরথী-হুগলী নদীর নিম্নাঞ্চল ধরে বাংলাদেশের ওপাশেও ছড়ানো রয়েছে। জমিতে সেচের কাজে বিপুল পরিমাণ ভূগর্ভস্থ জল ব্যবহার করার কারণে তলটিতে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটেছে। ক্ষেতে ঘনঘন সাবমার্সিবল পাম্প বসিয়ে বিশাল পরিমাণ জল তুলে আনা হয়, ফলে ভূগর্ভস্থ জলতল দ্রুত নীচে নেমে যায়। আর পাইরাইটের স্তর জেগে ওঠে। এই পাইরাইটের স্তরের সঙ্গে যখন বায়ুর সংস্পর্শ ঘটে তখন আর্সেনিক কম্পাউন্ড তৈরি হয়। যদি জলের স্তর উঁচুতে থাকে শূন্যস্থান যদি তৈরি না হয়, তাহলে বাতাসের সঙ্গে পাইরাইটের রাসায়নিক বিক্রিয়ার প্রশ্ন ওঠে না। তাই বর্ষার মরশুমে আর্সেনিক সমস্যা স্তিমিত থাকে। কিন্তু যখন থেকে উচ্চফলনশীল বীজের ব্যবহার শুরু হয়েছে, জলের প্রয়োজন বেড়ে গিয়েছে। ভূগর্ভস্থ জলের স্তর নীচে নেমে যাওয়ার দরুন শূন্যস্থান তৈরি হয়েছে। সেইজন্য পাইরাইটের মধ্যে আর্সেনিক রূপের সঙ্গে অক্সিজেনের বিক্রিয়ায় পানীয় জলে বিষ মিশেছে। বস্তুত উচ্চফলনশীল বীজে উৎপাদন দ্বিগুণ-তিনগুণ হয়েছে, সেইসঙ্গে চাষে জলের দাবি বেড়েছে এবং আর্সেনিক সমস্যা অনিবার্য রূপে প্রকট হয়েছে। তাই এই সমস্যার কারণ খুঁজতে খুঁজতে আমরা বিশ্বায়ন নিয়ন্ত্রিত আন্তর্জাতিক বীজবাজারে পৌঁছাতে পারি।

উপন্যাসে রত্না, শুভদীপ, আশিসদের বাণীতলা মঞ্চবিজ্ঞান সংস্থা, যাদবপুরের অধ্যাপক ডক্টর অভয়ংকর চক্রবর্তী বিষ্ণুপুর অঞ্চলে এবং তার আশেপাশে আর্সেনিক সমস্যার দরুন সচেতনতা ছড়ানো, প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে সচেষ্ট হয়েছে। অভয়ংকর চক্রবর্তী পশ্চিমবঙ্গের কৃষিতে সংখ্যাতত্ত্ব তুলে দেখিয়েছেন :

"১. সার ব্যবহার— ১৯৭৭-৭৮ এ ১৭২০০০ টন

১৯৯৪-৯৫ এ ৭৫৩৫৮২ টন

২. বিদ্যুৎচালিত পাম্পসেট— ১৯৭৮-৭৯ সালে ২২৪২৬ টি

১৯৯৪-৯৫ সালে ৯৯২৫৪ টি"।[৬]

অতিরিক্ত পাম্প এভাবে জল তুলতে তুলতে ভূগর্ভস্থ জলস্তর নামিয়ে এনেছে। হয়তো উৎপাদন বেড়েছে কিন্তু আর্সেনিকযুক্ত জলের সমস্যা তৈরি হয়েছে রাজ্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে। উপন্যাসে খ্যাদা বিষ্ণুপুর বা গাজন ও মালঞ্চের সর্দারপাড়া, রবিদাসপাড়া অঞ্চলের মানুষেরা এই সমস্যার শিকার হয়েছে। রবিদাসপাড়া, সর্দারপাড়ার হতদরিদ্র শ্রমজীবী মানুষগুলির তিনবেলা পেট ভরে খাবার জোগাড় করাই মুশকিলের বিষয়। সেখানে তারা পরিশুদ্ধ জলের সংস্থান করবে কিভাবে সেটা বড়ো প্রশ্নচিহ্ন। কিন্তু আর্সেনিক থেকে রেহাই পেতে এই দুটি বিষয়ই সবচেয়ে জরুরি। শশিমুখী বিদ্যালয়ে আলোচনাসভাতে ড. অভয়ংকর চক্রবর্তী একথাই এলাকাবাসীকে জানিয়েছেন, "প্রথমটি আর্সেনিক মুক্ত জল পেতে হবে; দ্বিতীয়টি, নিয়মিত পুষ্টির খাদ্যের প্রয়োজন"।[৭] এ অঞ্চলের দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষদের কারোরই ভালো রুজি-রোজগার নেই। ঠিকমতো খাওয়া জোটে না, কখনও ক্ষেতমজুরি, কখনও যোগালের কাজ, ঘর-ছাইবার কাজ

করে। অথচ দিনে ২৪০০ কিলো ক্যালরির কম খাদ্য যারা জোটাতে পারে, তাদের ভেতরে শতকরা ষাট শতাংশ মানুষ আক্রান্ত হবে আর্সেনিকের বিষে। যারা এর চেয়ে বেশি ক্যালরির খাদ্য পাবে তাদের ভেতরে সামান্যই আক্রান্ত হবে। গ্রামে আশিসদের বাড়ির টিউবওয়েলের জল সংগ্রহ করে ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হয়, রিপোর্ট আসে ভয়ানক, প্রতি লিটার জলে হাফ মিলিগ্রাম (.5mg) করে বিষ—যেখানে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার স্থির করা মান অনুযায়ী প্রতি লিটার জলে এক মিলিগ্রামের একশ ভাগের পাঁচ ভাগ পরিমাণ আর্সেনিকও যথেষ্ট নিরাপদ নয়। কিন্তু এই বেশি পরিমাণ আর্সেনিক থেকেও আশিসদের পরিবারে কারো কিছু হয়নি, চামড়ায় সামান্য কালচে দাগ। কারণ তাদের আর্থিক অবস্থা ভালো, পুষ্টিকর খাদ্য তারা পায়। আর্সেনিকে আক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সুষম খাদ্যের ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে। মালদাতে একটি বর্ধিষ্ণু গ্রামে একটি টিউবওয়েল বছরে ১৫৩ কেজি আর্সেনিক উদগীরণ করেছিল, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় মোতাহার হোসেন নামে এক জোতদারের পরিবার ওই জল খেয়েও আক্রান্ত হয়নি। সাধারণত দারিদ্রসীমার নীচে যারা বাস করে, তারাই দ্রুত আক্রান্ত হয় আর্সেনিকের বিষে। গ্রামের আর্থিক অবস্থা কিন্তু এই আর্সেনিক দূষণ থেকেই অনেকটা স্পষ্ট হয়। খাদ্য স্বাস্থ্য এবং অর্থনীতির সম্পর্ক সুনিবিড়।

এবারে যদি পানীয় জল ফিল্টারের প্রসঙ্গে আসি সেখানেও একই দুর্দশার ছবি চোখে পড়ে। এ অঞ্চলে অধ্যাপক অভয়ংকর চক্রবর্তীর আর্সেনিক সচেতনতা, প্রতিকারের যে তৎপরতা, এর কারণ রূপে অনেকেই মনে করে অধ্যাপকের ফিল্টারের ব্যবসা। বস্তুত ফিল্টারের জন্য দরিদ্র পরিবারের বছরে অতিরিক্ত একশো কুড়ি থেকে দেড়শ টাকা খরচ করা খুব কঠিন। আবার ফিল্টার ব্যবহারের বাস্তবিক কিছু অসুবিধা আছে, চাষবাস করা মানুষের খেটে এসে কুড়ি লিটার জলে রান্না-পান-স্নান সম্ভব নয়। আর আনাড়ি-অনভ্যস্ত মানুষের পক্ষে জল পাল্টে সঠিকভাবে শোধন করতে পারাটা বেশ কঠিন এবং পরিশুদ্ধ জল বানানোর জন্য ধৈর্য চাই।

রাষ্ট্র কিন্তু এই নিম্নবর্গের মানুষগুলির বেঁচে থাকার অধিকারকে সুরক্ষিত করতে পারেনি। রাষ্ট্রের যৎকিঞ্চিত আয়োজনের ক্ষেত্রেও কাদের অদৃশ্য অঙ্গুলি হেলনে এই নিম্নবর্গের মানুষগুলির ক্ষেত্রে জুটেছে বঞ্চনা-অপ্রাপ্তি। যেমন সর্দারপাড়ার মতো আর্সেনিক দূষিত অঞ্চলে একটি টিউবওয়েল নির্মাণে ৫০ পাইপের স্যাংশন ছিল কিন্তু নির্মিত হল ৩০ পাইপে। জাপানের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী যমুনার জল বিশুদ্ধ করে পাইপের মাধ্যমে টেনে অঞ্চলের মানুষের পানীয় সমস্যার সমাধানে পাইপ বসল ঠিকই, কিন্তু অদৃশ্য কারণে গাজন এবং মালঞ্চের সর্দারপাড়া ও রবিদাসপাড়াতে ঢুকল না এই পাইপ। এই কাজ নাকি পরে হবে। তাদের অধিকার ও দাবি-দাওয়া সুরক্ষিত করা বা বঞ্চনার বিরুদ্ধে কেউ উচ্চবাচ্য করল না।

উপন্যাসে দেখি মানুষগুলির অজান্তেই তাদের দেহে আর্সেনিকের বিষ প্রতিকারহীনভাবে প্রবেশ করেছে। প্রথমে রামপ্রসাদের শরীরে আর্সেনিক আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ পায়, সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। শ্যামার বউ তারপর মারা যায়। তারপর একে একে অন্নপূর্ণা, মালতী, শ্যামা প্রমুখ সবার শরীর সংক্রামিত হয়। প্রাণ যে মানুষের কত প্রিয়, মানুষের বাঁচার আকাঙ্ক্ষা কত প্রবল, লেখক অন্নপূর্ণার মাধ্যমে আমাদের তা জানিয়ে দেন। আক্রান্ত অন্নপূর্ণার মনে হয়েছিল সে কিছুতেই মরতে পারে না, সে যদি মরে তাহলে দেবতা মিথ্যে হয়ে যাবে, সে বনবিবির থানে মানত করেছিল, তার বিশ্বাস—"কিছুতেই সে মরতে পারে না। তালে ঠাকুর দেবতা সব মিথ্যে হয়ে যাবে··· আমি মরতে পারি? তালি সব দেবতা মিথ্যে হয়ে যাবে।"[৮] অন্নপূর্ণার যখন বোধ হয় পেটের ডান দিক থেকে একটি ব্যথা ক্রমাগত মোচড় দিয়ে দেহের গভীরে ঢুকে যাচ্ছে, তখন তার সন্দেহ জাগে, সত্যি কি সে আক্রান্ত। সে কখনওই গভীর কূপের জল ছাড়া খায় না, সর্বদা ফটকিরি ব্যবহার করে, অবশ্য ইদানীং প্রতিবেশী রেবারা জমি বিক্রি করে চলে যাওয়ার পর আর ফটকিরির সাহায্যও পায় না। আর তাই যদি ঘটে, সে যদি আক্রান্ত হয় তবে থানের ঠাকুরের প্রতি তার সামান্য বিশ্বাসও থাকবে না। অবশেষে বাঁচার এতখানি বাসনাকে বুকে করেই অন্নপূর্ণার করুণ পরিণতি ঘটে।

তবে দরিদ্র শ্রমজীবী নিরক্ষর মানুষগুলির ভাবনাতে—আর্সেনিক যে সত্যিই একটা বড়ো সমস্যা, শুধু রাজনৈতিক চাপান-উতোর নয় এবং এর জন্য ভাবনা-চিন্তা করা দরকার—এটুকু বোধোদয় তাদের হয়েছে। আর্সেনিক এই অঞ্চলের বেশিরভাগ মানুষের মনেই গভীর দুশ্চিন্তার ছাপ রেখে গিয়েছে—বিশেষত কোলের বাচ্চা, ছোটো ছেলেমেয়েদের জন্য। সমস্যা-সংকটের আবর্তে আটকে পড়া সর্দারপাড়া, রবিদাসপাড়ার মানুষদের এমন শোচনীয় অবস্থা, তারা কংগ্রেস কলে ঘোলা জল উঠলে সিপিএম কলে যায়। আর সিপিএম কলের দুরবস্থা হলে তখন ফটকিরির খোঁজ করে। জল একটু পরিষ্কার করে নেওয়ার জন্য। মানুষের পুষ্টির প্রয়োজনও মেটে না।

আলোচনার শেষে বলতে হয় অধুনা সময়ে বিশ্বায়নের কারণে নিম্নবর্গ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে যাচ্ছে। দেখা গেল চাষে উচ্চফলনশীল বীজ ব্যবহারের দস্তুর শুরু হওয়ার জন্য কৃষিতে জলের চাহিদা বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে, আর সেটার যোগানে মাঠে ঘন ঘন পাম্প বসিয়ে ভূগর্ভস্থ জল তোলা হয়েছে। এভাবে ভূগর্ভস্থ জলস্তর বহু নীচে নেমে যাওয়াতে পাইরাইটের স্তর জেগে উঠেছে এবং রাসায়নিক বিক্রিয়ায় আর্সেনিকের যৌগ গঠিত হয়ে জলকে দূষিত করেছে। আর্সেনিক দূষিত জল থেকে সবচেয়ে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে নিম্নবর্গের মানুষেরাই। কারণ আর্সেনিকের সঙ্গে মোকাবেলা করার জন্য পুষ্টিযুক্ত খাদ্য তারা জোটাতে পারে না। আবার পরিশুদ্ধ জল যোগানো তাদের পক্ষে কঠিন। অধিকাংশ নিম্নবর্গের মানুষ আর্সেনিকের বিষে আক্রান্ত হয়েছে এবং ইতিমধ্যে অনেকে মারাও গিয়েছে। সমগ্র জনপদে দুশ্চিন্তা চেপে বসেছে, তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বড়ো প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিয়েছে। যে উচ্চফলনশীল

বীজ ব্যবহারের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় আর্সেনিকের সমস্যা সেই বীজ নিয়ন্ত্রণ করে বিশ্ববাজার। কৃষি ব্যবস্থার উপরে তাদের নিয়ন্ত্রণ। বিশ্বায়ন শুধু মুষ্টিমেয় মানুষের ভালো থাকার দায়িত্ব নিতে পারে, নিম্নবর্গের মানুষেরা বিশ্বায়নের উন্নয়নের বাইরে। বিশ্বায়নের কারণে তারা ক্ষতিগ্রস্ত।

তথ্যসূত্র

১। জহর সেনমজুমদার, নিম্নবর্গের বিশ্বায়ন, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ২০১৭, পৃ ১১
২। পার্থ চট্টোপাধ্যায়, "ভূমিকা : নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার ইতিহাস", দ্র. গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), 'নিম্নবর্গের ইতিহাস', ১ম সং, কলকাতা, আনন্দ, ২০১৮, পৃ ৩, ৬, ৭
৩। রণজিৎ গুহ, "নিম্নবর্গের ইতিহাস", দ্র. গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), 'নিম্নবর্গের ইতিহাস', ১ম সং, কলকাতা, আনন্দ, ২০১৮, পৃ ৩২, ৩৩
৪। তদেব, পৃ ৩৩
৫। তদেব
৬। সাধন চট্টোপাধ্যায়, জলতিমির, (উপন্যাস সমগ্র ১), কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, ১৪১৮, পৃ ৩৭৬
৭। তদেব, পৃ ৩৯৮
৮। তদেব, পৃ ৪৩০